উপন্যাস

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

- নিদারুণ দুঃসংবাদ 2
- দুবলাল সিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার 10
- খগেনের আগমন 17
- ঝড়ের কালো মেঘ 25
- এক একটি দুর্ঘটনা 32
- শেষ মার 39

নিদারুণ দুঃসংবাদ

শ্রীমান পিলটু চক্রবর্তীর বয়েস বারো। সে মানুষ হচ্ছিল তার পিসেমশাই আনন্দবাবুর কাছে। রাঁচির নামকুমে।

পিলটু চক্রবর্তী আসলে কলকাতার লোক। কলকাতায় তা মা বাবা রয়েছেন এবং আরও দুটি ছোট ছোট ভাইবোন আছে। কিন্তু আজ চার বছর ধরে পিসেমশাই তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আর কলকাতার ছোট্ট বাড়ি, ঘোট ঘোট পার্ক আর অনেক মানুষের ভিড় থেকে পিসেমশাই-এর কাছে এসে তার চমৎকার দিন কাটছে।

বাড়ির সঙ্গে অনেকখানি জুড়ে মস্ত বাগান। কত রকমের গাছ, কত যে ফুল, তার তো কোনও হিসেবই নেই। উত্তর দিকটায় কয়েকটা ঝাউ আর শিরীষ গাছ এমনি অন্ধকার করে। রেখেছে যে, বিকেলের ছায়া পড়লে পিলটু তো আগে সেদিকে যেতে সাহসই পেত না। কিন্তু এখন আর তার ভয় নেই।

এই জন্যেই ভয় নেই যে, এবার তার জন্মদিনে পিসেমশাই তাকে একটা ভালো দেখে। এয়ার গান কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত যেসব এয়ার গান তোমরা উপহার পেয়ে থাকো, এ সে জিনিসই নয়। কর্কের মাথায় একটু বারুদ লাগানো থাকে, ঘোড়া টিপলে দুম করে একটু আওয়াজ হয় আর হাত। দশেক দূরে কর্কটা ছিটকে যায় রামোমোতাকে কি আর বন্দুক বলে! তার ঘা খেলে একটা মাছির বড় জোর মিনিট খানেকের জন্যে দাঁতকপাটি লাগতে পারে, অবিশ্যি যদি মাছিদের দাঁত থাকে। (আমি মাছিদের দাঁত কখনও দেখিনি, তবে দুপুরে ঘুমুলেই যে ভাবে ওরা এসে কুটুস করে আমার লম্বা নাকটার ডগায় কামড়ে দেয়, তাতে সন্দেহ হয়, দু-একটা দাঁত ওদের থাকলেও থাকতে পারে।)

কিন্তু মাছিরা এখন থাক, পিলটুর এয়ার গানের কথাই বলি। সেটা দস্তুরমতো রাইফেল। তাতে একটা হ্যাঁন্ডেলের মতো আছে, তাই দিয়ে হাওয়া পাম্প করে নিতে হয়। তারপর ভরে নাও একটা ছোট্ট সীসের গুলি। (পিলটুকে পিসেমশাই তাও এক বাক্স কিনে দিয়েছেন।) এইবার লক্ষ্য ঠিক করো-ঘোড়া টেনে দাও। একটুখানি শব্দ হল কেবল কটা! ব্যস-দেখতে পেলে টিকটিকিটা মারা পড়েছে, কিংবা চড়ুই পাখিটা ভিরমি খেয়েছে, নয়তো কাকটা কাকারে কাকা-জোরসে লাগা বলে উড়ে পালাচ্ছে, আর নইলে কাঠবেড়ালটা। একেবারে পাঁই পাঁই করে শিরীষগাছের মগডালে গিয়ে উঠেছে।

এই বন্দুকটা হাতে পাবার পর থেকেই আর কথা নেই। ঠিক দুকুর বেলা, যখন ভূতে মারে ঢেলা-চারদিক ঝিম ঝিম করে, বাগানের শিরীষ গাছগুলো ঝির ঝির আর ঝাউগুলো শাঁ শাঁ করে, দুরে সুবর্ণরেখার জল সোনার মতো চিক চিক করে আর বাড়িতে পিসেমশাই, পিসিমা, বুড়ো চাকর গোপাল, ঠাকুর রাম অওতার আর দারোয়ান খুবলাল সিং সবাই ঘুমোয় কিংবা ঝিমোয়, তখনও পিলটু উত্তর দিকের বনের ভেতরে একা একা ঘুরে বেড়ায়। পাখি আর কাঠবেড়াল শিকার করতেও চেষ্টা করে। অবিশ্যি সাতদিনেই কারও শিকারের হাত তৈরি হয় না, তবু এর মধ্যেই একটা কাকের লেজে সে যে গুলি লাগাতে পেরেছিল, সেটাও একেবারে কম কথা নয়।

পুজো সবে শেষ হয়েছে-এখনও সামনে লম্বা ছুটি। পিলটুর মা বাবা-ভাই-বোন পুজোর কদিনের জন্যে রাঁচি বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর কাল আবার কলকাতায় ফিরে গেছেন। কটা দিন খুব হইচই করে কাটিয়ে এখন ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে পিলটুর। শিকারেও আর মন বসছে না। উত্তর দিকের বনের ভিতরে ঢুকে, বন্দুকটা মাটিতে রেখে, একফালি ঘাসের ওপর চুপটি করে শুয়ে ছিল সে। কোথায় ঘুঘু ডাকছিল, এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল সোনা রঙের রোদের টুকরো- পিলটুর মনে হচ্ছিল, সে যেন আফ্রিকার জঙ্গলে

তাঁবু খাঁটিয়ে শুয়ে আছে। এখনই হয়তো মস্ত কেশরওয়ালা একটা সিংহ এসে হাজির হবে, আর সে তার রাইফেলটা তুলে–

কিন্তু সিংহের গর্জন শোনা গেল না, কানে ভেসে এল পিসেমশাইয়ের ডাক।

–পিলটু–পিলটু- উ- উ-

–আসছি পিসেমশাই–গলা তুলে সাড়া দিল পিলটু। বন্দুকটা কাঁধে তুলে ছুট লাগাল ঘাসের উপর দিয়ে। বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটার চারদিকে ঘিরে পিসেমশাই বসবার জায়গা তৈরি করেছেন একটা। রাতে চাঁদ উঠলে কিংবা দক্ষিণের হাওয়া দিলে কখনও কখনও একটা বালিশে আধশোয়া হয়ে পিসেমশাই ওখানে গড়গড়া টানেন আর পিলটুকে গল্প বলেন। সে কত রকমের গল্প! তরাইয়ের জঙ্গলে কীভাবে মাচাং বেঁধে বসে বাঘ শিকার করতেন, কিংবা হাজারিবাগের ফানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে কেমন করে ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি লড়েছিলেন–সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনী পিলটু অনেক শুনেছে! বলতে গেলে পিসেমশাইয়ের মতো শিকারি হতে পারাই তার জীবনের সব চাইতে বড় স্বপ্ন। আজও পিসেমশাই যখন সেই বাঁধানো জায়গায় এসেছেন আর তেমনিভাবে গড়গড়া নিয়ে বসেছেন, তখন নিশ্চয় ভালো গল্প শোনবার আশা আছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পিলটু হাজির হল। ধপাং করে বসে পড়ল পিসেমশাইয়ের কোলের কাছে।

–কী শিকার হল বীরপুরুষ?

–কিচ্ছু না।

–হাতি কিংবা গণ্ডার–কিছুই পাওয়া গেল না? নিদেনপক্ষে একটা গিরগিটি?

–বড় হয়ে মারব হাতি আর গণ্ডার। খুব নামজাদা শিকারি হব তখন–দেখে নিয়ে।

–হুঁ।–আনন্দবাবু প্রসন্ন চোখে একবার পিলটুর দিকে তাকিয়ে মোটা গোঁফজোড়ায় তা দিলেন।

পিলটু আরও ঘেঁষে বসল তাঁর কাছে।

–একটা গল্প বলো না পিসেমশাই!

–কীসের গল্প?

পিলটু বললে–বাঘের।

কিন্তু তারপরেই তার মনে হল, দিনের বেলায় বাঘের গল্প শুনতে ভালো লাগবে না। রাত্তিরবেলা বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করে ঝিঁঝি না ডাকলে কিংবা গাছপালায় ঘন অন্ধকার না জমলে, বাঘের গল্পে গা ছমছম করতে চাইবে না।

আনন্দবাবু অল্প-অল্প টান দিচ্ছিলেন গড়গড়ায়। পিলটু বলল–না, বাঘ নয়। তোমার ছেলেবেলার গল্প।

–ছেলেবেলার গল্প?

–হুঁ। আচ্ছা পিসেমশাই, তোমার এয়ার গান ছিল?

সগর্বে আনন্দবাবু বললেন–আলবাত। ছেলেবেলায় কার বা এয়ার গান না থাকে?

–তুমি শিকার করেছ তাই দিয়ে?

–নিশ্চয়। কে বলবে করিনি? তবে আরও অনেক করতে পারতুম, যদি না বাবা সেটা কেড়ে নিতেন।

পিলটুর কৌতূহল বাড়তে লাগল।

–তোমার বাবা বুঝি বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছিলেন? কী করেছিলে?

–বিশেষ কিছু নয়। মানে পাড়ার হাড়কৃপণ আর বেজায় খিটখিটে লোক হারুবাবুর চকচকে টাকে একদিন–

বলতে বলতে সামলে নিলেন পিসেমশাই–না, না, সে-সব কিছু নয়। ওকথা এখন থাক। আমি বরং বাঘের গল্পই বলি।

হারুবাবুর চকচকে টাকের প্রসঙ্গে বেশ উৎসাহিত হচ্ছিল পিলটু। প্রতিবাদ করে বলল–না পিসেমশাই, বাঘ নয়। সেই যে কৃপণ আর খিটখিটে হারুবাবু–

–পিলটু!

একটা খনখনে গলা বেজে উঠল কানের কাছেই। দুজনেরই চমক লাগল। পিসিমা এসে হাজির হয়েছেন।

পিসেমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন, পিলটু একবার ভয়ে ভয়ে পিসিমার দিকে তাকাল। পিসিমা মোটেই পিসেমশাইয়ের মতো নন। দারুণ রাশভারী, বেশ চড়া মেজাজ। পিলটুকে ভালোবাসেন না, তা নয়–খুব ভালোবাসেন। কিন্তু

সময় মতো পড়তে না বসলে কিংবা একটু গণ্ডগোল করলেই-সঙ্গে সঙ্গে রামবকুনি!

পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়েই পিলটুর বুঝতে বাকি রইল না, পিসিমার মেজাজ এখন ঠিক নেই। পিসিমা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ লক্ষ করলেন তাকে।

-পিলটু, একবার বাড়ির ভিতরে যাও। তোমার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমার কথা আছে।

পিলটু আর দেরি করল না। তক্ষুনি বন্দুকটা নিয়ে সুড়ুৎ করে বাড়ির ভিতরে হাওয়া হয়ে গেল।

কাঠগড়ার আসামীর দিকে জজসাহেব যেমন করে তাকিয়ে থাকেন, তেমনি করে পিসেমশাইয়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পিসিমা। তারপর-

-তুমি ওকে এয়ার গান কিনে দিয়েছ কেন?

-ছেলেমানুষ বলে। নিজে তো আর কিনতে পারি না-লোকে পাগল বলবে।

পিসিমা কড়া গলায় বললেন-থামো। ঠাট্টা করতে হবে না। একে তো দুষ্টু ছেলে-তায় বন্দুক হাতে পেয়ে রাতদিন হইচই করে বেড়াচ্ছে। জোর করে কাছে এনে রেখেছ, যদি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে না পারে, তা হলে রমেনের কাছে কৈফিয়ত দেবে শুনি?

রমেন পিলটুর বাবার নাম।

-ও ঠিক মানুষ হবে, তুমি ভেব না-আনন্দবাবু গড়গড়ায় টান দিলেন।

-ছাই হবে। পিসিমা ঠোঁট ওলটালেন-একেবারে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। ও-সব চলবে। আমি খগেনকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে কালই আসছে।

-খগেন পিসেমশাই চমকে সোজা উঠে বসলেন।

-হ্যাঁ, খগেন।-পিসিমার স্বর আরও কঠোর।

পিসেমশাই একবার খাবি খেলেন-খগেন কেন আসবে?

-সব ম্যানেজ করবার জন্যে। আমার মামাতো ভাইয়ের শালার বন্ধু বলেই বলছি না-ছেলেটি সব দিক থেকেই খাসা। বিলেত থেকে ফিরে এসেও কেমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ-

-ধার্মিক হয়েছে তিন বার ব্যারিস্টারি ফেল করেছে বলে, আর বাপ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল, সেই জন্যে।

পিসিমা ধমক দিয়ে বললেন-চুপ করো। আমি খগেনকে চিঠি লিখেছিলুম। কালই সে আসছে। আর শুধু যে আসছে তা-ই নয়। এখন থেকে এখানেই সে থাকবে।

এখানেই থাকবে। পিসেমশাই আবার খাবি খেলেন-খগেন থাকবে? সেই যে শেষরাতে উঠে বেসুরো কালীকীর্তন গায়, চারবার স্নান করে, গঙ্গাজল দিয়ে মুরগি খায় আর রাতদিন বলে ব্যায়াম করুন। সকালে ব্যায়াম, দুপুরে ব্যায়াম, বিকেলে ব্যায়াম, সন্ধেয় ব্যায়াম, মাঝরাত্তিরেও ব্যায়াম। একবার দিল্লিতে সাতদিন আমার বাসায় ছিল, ব্যায়ামের উপদেশে শক্ত ব্যারামে পড়বার জো হয়েছিল আমার!

-ভয় নেই, তোমাকে ব্যায়াম শেখাবে না। পিলটুর জন্যেই সে আসছে।

–বেচারা!

পিসিমা ভ্রূকুটি করে বললেন–তুমি তো ছেলেটার মাথা খাচ্ছ, দেখি খগেন এসে ওকে বাঁচাতে পারে কি না!

–বাঁচাবে? মেরে ফেলবে!

পিসিমা গর্জন করে বললেন হয়েছে, আর দরকার নেই। আমি যা বলছি তা-ই শোনো। খগেন আসবেই-কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

বলে, পিসিমা চলে গেলেন।

হা হতোস্মি! মানে-গেলুম! পিসেমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন সেখানেই।

.

দুবলাল সিংয়ের অ্যাডভেঞ্চার

খুবলাল সিং আনন্দবাবুর দারোয়ান।

ভালো মেজাজের লোক। খায়-দায়, লাঠি কাঁধে এদিক ওদিক চক্কর দেয়, ফাইফরমাস খাটে। ভালো মনিব, সুখের চাকরি। কিন্তু সম্প্রতি সে খুব মুস্কিলে পড়েছে।

মুস্কিল আর কিছু নয়-দেশ থেকে তার ভাইপো দুবলাল সিং এসে হাজির হয়েছে। নামের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। খুবলাল বেশ লম্বাচওড়া জোয়ান, কিন্তু খাস হিন্দুস্থানী হয়েও দুবলাল একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা। গুণের মধ্যে কেবল ঘুমুতে পারে আর ছারা–র‍্যা র‍্যা বলে হোলির ছড়া কাটতে পারে।

খুবলালকে দুবলাল চেপে ধরেছে। একটা চাকরি তাকে পাইয়ে দিতে হবে।

শুনে, গোঁফে চাড়া দিয়েছে খুবলাল।–চাকরি আছে, বেশ ভালো চাকরি। সম্প্রতি মাইল কয়েক দূরে একটা বড় ফলের বাগান কিনেছেন আনন্দবাবু। কলা, আমরুদ (পেয়ারা), পিচফল, আর আনারস সেখানে বিস্তর ফলে। কিন্তু বাঁদরেই খায় আর চুরিও যায়। সেই বাগান পাহারা দেবার জন্যেই লোক দরকার। আরামে থাকতে পারবে, পেট ভরে ফলও খেতে পারবে।

দুবলালের চোখ চকচকিয়ে উঠেছে।

–তা হলে ওটা আমারই চাই। পাইয়ে দাও চাচা।

–তোকে?–চোখ বাঁকা করে তাকিয়েছে খুবলাল।

–কেন? আমি পারব না?

-পারবি না কেন? খেতে তুই ভালোই পারবি। তোর মতো একটা ধেড়ে বাঁদর থাকতে ছোটখাটো বাঁদরেরা গাছের একটা ফলও ছুঁতে পারবে না সে আমার বেশ মালুম আছে। কিন্তু বাবু তোকে নেবে না।

-কেন নেবে না?-দুবলাল ব্যথা পেয়েছে মনে। বলেছে-তামাম হাজারিবাগ জিলায় আমার মতো হোলির ছড়া কে কাটতে পারে, শুনি?-এই বলে কানে হাত দিয়ে সুর ধরেছে—ছ্যা-রা-রা-রা। আরে, বৃন্দাবন কি বন্‌মে ডোলে-ডোলে বনোয়ারী—হাঁ—ছ্যা-রা-

-বাস্, খামোশ।-হাউমাউ করে উঠেছে খুবলাল-আর চেঁচালে বাবু এখুনি তোকে-আমাকে বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বার করে দেবে। আরে, ওতে চিড়ে ভিজবে না। খুব একটা জোয়ান কি-মানে জব্বর কোনো পালোয়ানী দেখাতে পারলে তবেই। কিন্তু এই তো একটা মুসা ভি মারতে পারিস না। কে চাকরি দেবে তোকে?

-তা হলে অত আমরুদ, কলা, পিচফল আর অমন একটা খাসা চাকরি ফসকে যাবে চাচা?-বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছে দুবলাল।

তখন গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভেবেছে খুবলাল। চারবার গোঁফে তা দিয়েছে, তিনবার টিকিতে গিঠ দিয়েছে আর খুলেছে। তারপর বলেছে-হাঁ, মতলব এসেছে একটা।

-কী মতলব?

-গিন্নীমা আর বাবুর খুব চোরের ভয়। আজ রাতে তুই বাগানে ঢুকে নীচের জানলার একটা কাঁচ ভেঙে ফেলবি।

www.bengaliebook.com

–খামকা শিসা টুটিয়ে দিব?

–খামকা কেন রে বুদ্ধু? তুই শিসা ভাঙলেই ঝনঝন করে আওয়াজ উঠবে। তখন আমি কাঁহা চোট্টা কাঁহা চোট্টা বলে দৌড়ে বেরুব। আর তুই একটা লাঠি হাতে করে এসে বলবি, আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম, তাইতেই চোট্টা হায় বাপ বলে ভাগলপুরমে ভাগ গিয়া। বাস, কাজ হাসিল!

খানিকক্ষণ ভেবেছে দুবলাল। শেষে ঘাড়-টাড় চুলকে বলেছে–তব ঠিক হ্যায়।

সেদিন রাত্রে আনন্দবাবু বিষণ্ণ হয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে আছেন। খগেন আসর্বে-এই চিন্তাই তাঁর মাথার ভিতরে একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মতো ঘুরছে। আর হয়তো এসেই কালীকীর্তন জুড়ে দেবে। বলবে–এখন হাফপ্যান্ট পরুন, তখন মাথা নিচু করে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকুন পা তুলে। আর, শেষরাতে উঠে পাকা এক পো ছোলা খান।

তা হলে আনন্দবাবু আর নেই!

আর পিলটু? সে তো নেহাত বেঘোরেই মারা যাবে!

কিন্তু গিন্নীকে কিছু বলবার জো নেই। আনন্দবাবু তাঁকে যমের মতো ভয় পান।

গিন্নী এখনও ঘরে আসেননি, নীচের ঘরে কী নিয়ে যেন চেঁচামেচি করছেন। খগেনের হাত থেকে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় এই দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর মাথা ঘুরছে, সেই সময় বাড়ির পুরনো চাকর গোপাল তাঁর রোজগার বরাদ্দ দুধের গ্লাস নিয়ে এসে হাজির হল।

আনন্দবাবু একবার আড়চোখে তাকালেন। দুধ খেতে তাঁর একেবারে ভালো লাগে না, কিন্তু গিন্নীর শাসনে মুখ ফুটে সে কথা বলবার জো নেই।

–আজ দুধটা না-ই খেলুম গোপাল।

–তা হলে গিন্নীমাকে গিয়ে বলি সে কথা।–গোপালের স্বর গম্ভীর।

–থাক, থাক, দে–

যেমন করে লোকে কুইনিন মিকশ্চার খায়, তেমনি ভাবেই দুধটা খেতে হল আনন্দবাবুকে। তারপর কাতরদৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকালেন তিনি।

–শুনেছিস?

নেপাল কম কথা বলে। সংক্ষেপে জবাব দিল–শুনেছি।

–কী শুনেছিস?

–খগেনবাবু আসছেন।

–তাকে মনে আছে তোর?

–তেনাকে কে ভুলবে বাবু? রাত্তির পোয়াতে না পোয়াতে সেই বাজখাই গলার গান, কানে তালা ধরে যেত। তার ওপর পেস্তার শরবত বানাতে বানাতে আমার হাড় কালিয়ে যেত।

–হুঁ–গোপালের মুখের দিকে চেয়ে আনন্দবাবু বললেন কী করা যায় বল তো?

–এজ্ঞে ভগবানকে ডাকুন, তিনিই ভরসা।

আনন্দবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–সবাই বলে, ভগবান ভরসা। কিন্তু ভগবানও খগেনকে ভয় পান।

গোপাল বলল–আচ্ছা, পরে দেখা যাবে। এখন শুয়ে পড়ুন।

হতাশ হয়ে আনন্দবাবু বললেন–তাই যাই, শুয়েই পড়ি। কিন্তু ঘুম কি আর আসবে?

ঘুম কিন্তু এল। শোবার দশ মিনিটের মধ্যেই আনন্দবাবুর নাক ডাকতে লাগল।

সেই নাকের ডাক অনুসরণ করেই বাগানের ভিতর গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছিল দুবলাল সিং। আর একটু এগোলেই জানলা। একখানা কাঁচ ভেঙে ফেলবার ওয়াস্তা। তারপরেই কেল্লা ফতে! পেয়ারা, কলা, আনারস আর পিচফলের কথা ভাবতে গিয়েই জিভের ডগায় তার জল আসছে।

আর ঠিক সেই সময় শ্রীমান পিলটু চক্রবর্তীর ঘুম ভাঙল।

পিলটু স্বপ্ন দেখছিল। এয়ার গান নয়, রাইফেল হাতে নিয়ে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়েছে। দূরে গরিলার হাঁক শোনা যাচ্ছে, মাথার উপর অন্ধকার বাওবাব। গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে মাথা ঝুলিয়ে শিকারের অপেক্ষা করছে পাইথন, আওয়াজ তুলছে শোঁ শোঁ। হায়নারা হেঁকে উঠছে থেকে থেকে, গরগর শব্দে কোথায় ঝগড়া করছে চিতা বাঘ। এমন সময় কোত্থেকে হুম্ করে একটা সিংহ একেবারে সামনে এসে হাজির।

সিংহটাকে রাইফেল দিয়ে গুলি করতে যাবে, হঠাৎ দেখে হাতে রাইফেল তো নেই, রয়েছে একটা চকোলেট। সর্বনাশ!

আর তখনি সিংহ পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল–দাও না হে, চকোলেটটা খাই!

বলতে বলতেই সিংহের মুখটা সুকুমার রায়ের হ্যবরল-এর ব্যাকরণ সিংয়ের মতো হয়ে গেল। দারুণ চমকে জেগে উঠল পিলটু। জেগে উঠল আফ্রিকার জঙ্গলে নয়, নিজের ঘরে, বিছানার উপর। দেখল, ঘরে নীল বাবের আলো জ্বলছে আর টেবিলে পড়ে রয়েছে তার এয়ার গানটা।

কিন্তু বাইরে কেমন একটা খস খস শব্দ হচ্ছে না? মনে হচ্ছে বাগানের ভিতর কে যেন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে! টুপ করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল পিলটু। চলে এল জানলার কাছে।

পরিষ্কার দেখতে পেল, একটা টর্চের আলো বাগানের মধ্যে জ্বলেই নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর চোখে পড়ল, ঝোঁপের আড়ে আড়ে কে যেন এগোচ্ছে ছায়ার মতো।

নিশ্চয় চোর! বাগানে চোর ঢুকেছে।

চট করে টেবিল থেকে এয়ার গানটা তুলে নিল পিলটু।

দুবলাল সিং চুপি চুপি এগোচ্ছিল। আর একটু-আরও একটু হ, এইবার। কাঁচের ওপর একটা ঘা বসিয়ে দিতে পারলেই–

–খটাস–

জানলায় পিলটুর এয়ার গানের শব্দ হল।

–আরে দাদা–মর গইরে–

নাকে এসে লেগেছে এয়ার গানের গুলিটা। টর্চ আর লাঠি ফেলে দুই লাফে দুবলাল সিং হাওয়া হয়ে গেল।

–চোর-চোর-চোর–

আর ওদিকে দুবলালের কান ধরে ঠাঁই ঠাঁই করে দুটো চাঁটি বসিয়ে তাকে খাঁটিয়ার তলায় চালান করে দিল খুবলাল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল–সব গড়বড় কর দিয়া–বুদ্ধু কাঁহাকা!

.

খগেনের আগমন

কালী গো, কেন ন্যাংটা ফেরো,
শ্মশানে মশানে ফেরো-

সকাল বেলায় বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন আনন্দবাবু। সবে চা খেয়েছেন, মুখে গড়গড়ার নল-মেজাজটা বেশ খুশিই আছে আপাতত। এমন কি, একটু আগেই বাড়ির সামনে ঘটঘট আওয়াজ করে যে একটা মোটর সাইকেল এসে থেমেছে, সেটা। পর্যন্ত শুনতে পাননি। কিন্তু বিকট ওই গানের শব্দটা তাঁর কানের কাছে বোমার আওয়াজের মতো ফেটে পড়ল।

তাকিয়ে দেখলেন-খগেন!

একেবারে নির্ভুলভাবে খগেন-আদি এবং অকৃত্রিম! গায়ে ধুসো একটা গলাবন্ধ কোট, মুখভর্তি গোঁফদাড়ি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, ষাঁড়ের মতো এক বিরাট জোয়ান। তারই গলা থেকে বেরুচ্ছে এই রাসভরাগিণী-কালী গো, কেন ন্যাংটা ফেরো-

যেন ভূত দেখেছেন, এমনি ভাবে চেয়ে রইলেন বেচারি আনন্দবাবু।

আমাকে চিনলেন না? ঝাঁটা গোঁফের ভেতর থেকে সারি সারি লাউয়ের বিচির মতো দাঁত বের করল খগেন-আমি খগেন। খগেন বটব্যাল।

-বিলক্ষণ! তোমাকে না চিনে উপায় আছে?

-আনন্দবাবুর মুখোনা হাঁড়ির মতো দেখাল।

–আমি আসাতে আপনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন?–খুশি হওয়ার কারণ দেখছি না।

–দেখছেন না?–খগেন কিছুমাত্রও দমে গেল না–তা আপনি খুশি না হলেও কিছু আসে যায় না। কাকিমাই আমায় চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি খুশি হবেন।

–অঃ।

খগেন ঘড়ঘড় করে একটা চেয়ার টেনে এনে ধপাৎ করে বসে পড়লকাকিমার চিঠিতেই জানলুম, এখানে আমাকে নাকি দারুণ দরকার। আমি অবশ্য আজকাল কালী সাধনায় মন দিয়েছি, বিষয়-আশয়ের দিকে ফিরে তাকাইনে। তবু কাকিমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ভাবলুম, মায়ের ইচ্ছে, তাই এলুম।

–তা বেশ!

খগেন এবার খবরের কাগজটার দিকে তাকাল।

–কী পড়ছেন ওটা? কাগজ? ছছঃ! কেন যে ওসব বাজে জিনিস পড়ে সময় নষ্ট করেন। বরং সকালে উঠে এক মনে মোহ-মুদগর পড়বেন, দেখবেন, চিত্ত পবিত্র হয়ে যাবে। শুনুন–নলিনী দলগত জলমতি তরলং, তদ্বৎ জীবন অতিশয় চপলং–অর্থাৎ বুঝলেন কিনা, পদ্মপাতায় যেমন জল, এই জীবনও তেমনি অত্যন্ত–কী বলে–

আনন্দবাবু বললেন–কিছুই বলে না।

–বলে না? মানে?–খগেন চটে উঠল–আলবাত বলে।

–তা হলে বলো!–আনন্দবাবু কাতর হয়ে উঠলেন–কিন্তু তুমি আর কিছু বোলো না। যেটুকু বলেছ, তাতেই আমার মাথা ঘুরছে।

–ঘুরছে নাকি? খগেন খুশি হল–তা হলে আপনার হবে।

–কী হবে?–আনন্দবাবু চমকে গেলেন।

–জ্ঞান। জ্ঞান যত বাড়তে থাকবে, ততই মাথা ঘুরবে, কান কটকট করবে, দাঁত কনকন করবে, গাঁটে গাঁটে বাত দেখা দেবে বলতে বলতে আনন্দে খগেনের গোফদাঁড়ি সব যেন নাচতে শুরু করে দিল।

উঠে ছুটে পালাবেন কিনা ভাবছিলেন আনন্দবাবু, এমন সময় পিলটুর পিসিমা এসে গেলেন।

–এই যে খগেন। কখন এলি?

–এইমাত্র। কাকাবাবুর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করছিলুম।

–আচ্ছা, সে পরে হবে। এখন হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খাবি আয়।

–জলখাবার? দি হোলি মাদার-এর উপাসনা–মানে কালীকীর্তন না করে তো জলস্পর্শ করিনে কাকিমা!

–তবে কালীকীর্তন সেরে নে। আমি তো ের খাবারের ব্যবস্থা করি।

–চলো তবে।–খগেন উঠে পড়ল–তবে আমি সামান্যই জলখাবার খেয়ে থাকি। মানে, সকালে ছটা মুরগির ডিম, বারো খানা টোস্ট, চারটে আপেল আর ছটা সন্দেশ হলেই আমার চলবে, কাকিমা।

আনন্দবাবু একটা বিষম খেলেন।

–তুমি কালীভক্ত হয়ে মুরগি খাও?

ঝাঁকড়া দাড়িগোঁফের আড়ালে আবার লাউয়ের বিচি বেরিয়ে এল। মানে, খগেন হাসল।

–আপনি দেখছি শাস্ত্র কিছুই জানেন না, কাকা! সংসারের কোনও জীবকেই ঘৃণা করতে নেই। সব সমান।

–অঃ!

গিন্নী একবার কটমট করে তার দিকে তাকালেন।

–খগেনের সঙ্গে শাস্তর নিয়ে তুমি আর তক্কো করে না বাপু। সারাটা জীবন তো চাকরি করলে আর ইংরেজি বই পড়লে। শাস্তরের তুমি কী জানো?

–কিছু না! কিছু না!–বলে আনন্দবাবুকে নস্যাৎ করে দিয়ে খগেন তার কাকিমার সঙ্গে কালীকীর্তন গাইতে চলে গেল।

আনন্দবাবু সেই ভাবেই বসে রইলেন। খগেন এসেই তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ছটা ডিম, বারোটা টোস্ট, চারটে আপেল আর ছটা সন্দেশ দিয়ে যার প্রাতরাশ শুরু হয়, রাতের বেলা সে মানুষ ধরে খেতে চাইবে এমনি একটা গভীর আশঙ্কা দেখা দিল তাঁর মনে।

কিছুক্ষণ পরেই বন্দুক হাতে পিলটুর প্রবেশ।

–পিসেমশাই?

–কী খবর পিলটু?

–ও লোকটা কে পিসেমশাই? ওই যে মুখভরা দাড়িগোঁফ আর বিকট গলায় গান গাইছে?

আনন্দবাবু চিচি করে বললেন–খগেন।

–কে খগেন?

–ও তোমার পিসিমার মামার শালার মাসতুতো ভাইয়ের কীসের যেন কী হয়। কিন্তু আসলে ও হল খগেন। ভয়ঙ্কর খগেন।

–খগেন কী করে পিসেমশাই?

–তিনবার ব্যারিস্টারি ফেল করে। ক্যাশিয়ার হয়ে দুটো ব্যাঙ্ক ফেল করায়। কালীকীর্তনের নামে বেসুরো গলায় গাঁক গাঁক করে চেঁচায়। গঙ্গাজল দিয়ে মুরগি রাঁধে। আর পিলটুকে পড়ায় আর ব্যায়াম করায়।

শুনে পিলটু দারুণ চমকে উঠল।

–কী বললে? আমাকে পড়াবে আর ব্যায়াম করাবে? এই পুজোর ছুটিতে?

–সেই জন্যেই এসেছেন।

–কক্ষনো না!–পিলটুর গলায় জ্বালাময় প্রতিবাদ–কী অন্যায়। ছুটির মধ্যে পড়তে আমার বয়ে গেছে!

–পড়তেই হবে। তুমি না পড়লেও দেখবে ও তোমায় পড়িয়ে ছাড়বে।

–দেখি, কেমন করে পড়ায়। ভারি বিচ্ছিরি কিন্তু ওই খগেন।

–খুব সম্ভব।

–আর কী বাজে ওর গোঁফ। এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা–

আনন্দবাবু বললেন–ছিঃ, মাস্টারকে বলতে নেই ওসব।

–মাস্টার না হাতি!

–পিলটু!

পিসিমা এসে ঢুকলেন। আনন্দবাবু তক্ষুনি কাগজটা তুলে নিলেন–পড়তে লাগলেন এক মনে। আর পিলটু দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

চশমাটা নাক থেকে একটু নামিয়ে কড়া চোখে পিসিমা কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পিলটুর দিকে।

–সকাল থেকেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছ? পড়াশুনো তোমার কিছু হবে?

–হবে পিসিমা। রাত্তির হলে।

–সে তো দেখতেই পাচ্ছি কদিন ধরে। চলো এখন।

–কোথায়?

–তোমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করবে।

করুণ চোখে পিলটু একবার পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল। পিসেমশাই একবার তাকালেন মাত্র। তারপর কাঁচপোকা যেমন করে তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়-তেমনি করে পিসিমার পিছন পিছন প্রস্থান করল পিলটু।

আনন্দবাবু কেবল বলতে পারলেন-বেচারা!

কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটল ঘন্টা দেড়েক পরেই।

পিলটু তখন খগেনের পাল্লায় পড়েছে। আর খগেন তাকে জ্ঞান দান করছে প্রাণপণে।

-বিদ্যেটা পরে, আগে আত্মার উন্নতি। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার আত্মা অত্যন্ত ছটফটে। তা হলে তো চলবে না। অশান্ত আত্মা হচ্ছে জলের মতো তরল, তাকে আইসক্রিমের মতো জমিয়ে ফেলা দরকার। আর আইসক্রিম...ও কী? কী দেখছ ওদিকে?

-একটা হলদে পাখি।

-না, হলদে পাখি নয়। আত্মা হচ্ছে তা হলে আইসক্রিম। আর–

-আমি আইসক্রিম খাব।

-শার্ট আপ-খগেন চটে গিয়ে পিলটুর কান ধরে মোচড় দিল একটা-খাওয়ার কথা পরে। এখন শোনো। আইসক্রিম করে কী দিয়ে? বরফ। আত্মাকে জমাতেও বরফ চাই। সে বরফ কী? আধ্যাত্মিক ব্যায়াম। বুঝেছ?

রাগে পিলটুর সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। পিসেমশাইয়ের কাছে আসবার পর থেকে কেউ তার গায়ে কখনও হাত দেয়নি। খগেনের কানমলা খেয়ে চোখ ফেটে জল আসছিল তার।

খগেন বলল-বোঝোনি? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে কাঁকড়া বিছের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দিলুম একে বলে বৃশ্চিকাসন।বলতে বলতে নিচু হয়ে পিছনের একটা পা লেজের মতো উপরে তুলে খ্যাঁক করে লাফ দিল খগেন-এর নাম মর্কটাসন–

কিন্তু পিলটু চক্রবর্তী আর অপেক্ষা করল না। এয়ার গান তুলে খগেনের পিঠের দিকে তাকালে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে আর একবার মর্কটের মতো লাফাল খগেন। বলতে লাগল-এই আসন যদি ঠিকমতো করা যায়–

–খটাস–

এয়ার গানের গুলি এসে লাগল খগেনের পিঠে।

–বাপরে–

এবার আর মর্কট লাফ নয়–একেবারে সমুদ্রলঙ্ঘন লক্ষ দিল খগেন। আর সেই সুযোগে তীরবেগে বন্দুক কাঁধে করে বনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল পিলটু।

.

ঝড়ের কালো মেঘ

আনন্দবাবুর একটু ঝিমুনি এসেছিল।

স্বপ্ন দেখছিলেন, খগেন রক্তবস্ত্র পরে একটা খাঁড়া হাতে করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। বলছে–হুঁ–হুঁ-মুরগিতে কুলোবে না, নরমাংস খাব!

-দোহাই বাপু, আমাকে খেয়ো না-চেঁচিয়ে আনন্দবাবু এই কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কে যেন ডাকল : বাবু! চোখ মেলে আনন্দবাবু দেখলেন, গোপাল।

–এগুলো সব আপনার ঘরে থাকবে। পিলটুবাবুর বন্দুক আর টোটা।

–এখানে থাকবে কেন?–আনন্দবাবু আশ্চর্য হলেন।

-গিন্নীমা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন-আহা-হা, ছেলেমানুষ! ওরটা অমন করে কেড়ে নেওয়া কেন! ভারি অন্যায়!

-সেসব গিন্নীমা জানেন।

বলতে বলতেই পিলটুর পিসিমা এসে ঢুকলেন। গোপাল এক পাশে সরে দাঁড়াল।

আনন্দবাবু বললেন–তুমি পিলটুর বন্দুক–

সূচিপত্র

পিলটুর পিসিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন-সেই কথাই বলতে এসেছি। আদর দিয়ে মাথাটা তুমি খেয়ে দিয়েছ একেবারে। একদম গোল্লায় পাঠিয়েছ।

-কাকে? খগেনকে?

-খগেন গোল্লায় যাবে কেন? খাসা ছেলে। তার মাথা খাবারই বা তুমি কে? আমি পিলটুর কথা বলছি।

-অঃ!

-জানো, পিলটু কী করেছে?

-কী?

-এয়ার গান দিয়ে খগেনের পিঠে গুলি করেছে।

-কী সর্বনাশ!-আনন্দবাবু আঁতকে উঠলেন।

ধিক্কার-ভরা গলায় পিলটুর পিসিমা বলে চললেন-খগেন ওকে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম শেখাচ্ছিল, সেই ফাঁকে এই কাণ্ড। খগেনের সঙ্গে যখন ওর আলাপ করিয়ে দিই, তখনই ওর চোখমুখের চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। একেবারে বাঁদর হয়ে গেছে ছেলেটা। রমেনকে কী বলবে শুনি?

আনন্দবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

-যাই হোক, পিলটুর ব্যবস্থা আমি করছি। আপাতত এই টোটা আর বন্দুক জমা রইল তোমার কাছে। খবরদার, পিলটুর হাতে যেন না যায়। খেয়াল থাকবে?

–থাকবে।

গিন্নী ঘর কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বন্দুকটার দিকে কিছুক্ষণ করুণ চোখে চেয়ে রইলেন আনন্দবাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। বেচারি পিলটু।

গোপাল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে আনন্দবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন–ছেলেবেলায় কখনও এয়ার গান ছুঁড়েছিস গোপাল?

–এজ্ঞে ছুঁড়িছি।

–পেলি কোথায়?

–এজ্ঞে, গাঁয়ের জমিদারের ছেলের একটা ছেলে। তা তিনি মোটে তাক করতে পারত না। আমি তেনার বন্দুক নিয়ে দনাদন শালিক পাখি, কাঠবেড়ালী এই সব মেরে দিতাম।

–আমারও বন্দুক ছিল। নিখুঁত তাক ছিল আমার। কুড়ি হাত দূর থেকে আরশোলা মারতে পারতুম। সবাই বলত, হ্যাঁ, হাত বটে খোকনের।

–আমারও খুব তাক ছিল এজ্ঞে। গোপাল জবাব দিল।

–আমার মতো নয়। গোপাল কী বলতে যাচ্ছিল, দূর থেকে গিন্নীর ডাক এল- গোপাল-গোপাল

–যাই এজ্ঞে, মা-ঠান ডাকছেন।

বন্দুকটা কোলে করে আনন্দবাবু বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখে পড়ল, দরজার বাইরে কাতরভাবে পিলটু দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

সূচিপত্র

-পিলটু। এসো এখানে।

চোরের মতো পিলটু এসে ঘরে ঢুকল।

-খগেনকে গুলি করেছ?

পিলটু চুপ।

-খুব অন্যায় করেছ।

-ও মিছিমিছি আমার কান মলে দিলে কেন?

-গুরুজনেরা ও রকম মিছিমিছিই কান মুচড়ে দেয়।

-গুরুজন না ঘোড়ার ডিম!-পিলটু ঠোঁট ওলটাল।

-ছিঃ, বলতে নেই ওসব।

পিলটু গোঁজ হয়ে রইল।

আনন্দবাবুর কৌতূহল বাড়তে লাগল।

-ঠিক পিঠে মেরেছ খগেনের?

-হুঁ, পিসেমশাই।

-কত দূর থেকে?

-এই হাত পাঁচেক।

–মোটে? আমি কুড়ি হাত দূর থেকেও সোজা ওর নাকে মারতে পারতুম। কথাটা বলেই আনন্দবাবু লজ্জা পেয়ে, ঘুরিয়ে নিলেন কথাটা তাড়াতাড়ি।

–খুবই অন্যায় করেছ পিলটু।

–হুঁ।

–তোমার বন্দুক তো বাজেয়াপ্ত। এখন কী করছ?

পিলটু গোঁ গোঁ করে বললে–পিসিমা ত্রিশের প্রশ্নমালা থেকে আঠারোটা শক্ত শক্ত প্রশ্নের অঙ্ক কষতে দিয়েছে।

–কপাল!–সহানুভূতিভরা গলায় আনন্দবাবু বললেন করো গে যাও।

–ওই খগেনটা কেন এল পিসেমশাই?–পিলটু আবার গজগজ করতে লাগল–ও না। এলে তো কোনও গণ্ডগোল হত না।

–চুপ–চুপ!–সভয়ে আনন্দবাবু পিলটুকে থামিয়ে দিলেন–তোমার পিসিমা শুনতে পেলে আঠারোর জায়গায় আটান্নটা অঙ্ক চাপিয়ে দেবেন তোমার ঘাড়ে। এখন যাও, লক্ষ্মীছেলের মতো আঠারোটাই কষে ফেলো।

পিলটু চলে গেল।

আনন্দবাবু বন্দুকটা হাতে করলেন। তাঁর চোখ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। স্মৃতির সামনে ময়মনসিংহের সেই ছেলেবেলার দিনগুলো ভাসছে। একটা মস্ত মাঠের ভিতর বড় বড় সবুজ ঘাস চামরের মতো দুলছে। সেই ঘাসবনে আনন্দবাবু ঘুরছেন বন্দুক হাতে। ওই তো একটা মেটে রঙের মস্ত খরগোশ! তাক করলেন, ঘোড়া টিপলেন, তারপর–

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মনটা ফিরে এল বর্তমানের ভেতর।

হাতের তাক তাঁর তো যায়নি। বড় হয়ে শিকার করেছেন সুন্দরবনে, হাজারিবাগের জঙ্গলে। এয়ার গানের লক্ষ্যও কি তাঁর ব্যর্থ হবে?

ঘরের কোণে টেবিলের উপর মাটির তৈরি একটা বুড়োর মূর্তি। আনন্দবাবু বসা অবস্থাতেই সেটাকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলেন।

–খটাস।

মুর্তিটার বাঁ কান উড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

–ইউরেকা! পেয়েছি!–উল্লাসে দাঁড়িয়ে উঠলেনব আনন্দবাবু–সেই ছেলেবেলার নিখুঁত তাক এখনও আছে। কিন্তু আরও ভালো করে যাচাই করতে হচ্ছে। কী করি? কী মারব?

বন্দুক হাতে করে ছেলেমানুষের মতো এগিয়ে গেলেন তিনি জানলার কাছে।

.

বাগানের ভিতরে বসে পরমানন্দে তখন মুরগি ছাড়াচ্ছিল খগেন। গলা দিয়ে তার উকট রাগিণী বেরিয়ে আসছে–এবার কালী তোমায় খাব–

তার থেকে প্রায় পনেরো গজ দূরে জানলা দিয়ে আনন্দবাবু মুখ বার করলেন।

–কী করি? কী মারব?

কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। কেবল খগেনকে ছাড়া।

সূচিপত্র

আনন্দবাবুর মাথার ভিতরে দুই সরস্বতী ভর করল। পিলটু খগেনের পিঠে গুলি করেছিল পাঁচ হাত দূর থেকে। আমি পারব না পনেরো গজ দূর থেকে? এতই কি অসম্ভব?

কী করছেন বোঝবার আগেই শব্দ হল-খটাস!

-ওরেঃ বাবা!-

শূন্যে একটা লাফ মারল খগেন। আর তৎক্ষণাৎ টুপ করে জানলার নীচে ডুবে গেলেন আনন্দবাবু।

শুধু একজন লোক ব্যাপারটা দেখতে পেল। বাগানের ভিতর ছাগল বাঁধতে এসে স্তম্ভিত চোখে সে দেখেছিল আনন্দবাবুর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

সে ওই বাড়ির দারোয়ান-দুবলাল সিংয়ের চাচা খুবলাল সিং।

.

এক একটি দুর্ঘটনা

ঝড়ের মতো খগেনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দবাবুর ঘরে ঢুকলেন পিলটুর পিসিমা। ভয়ে, লজ্জায় আনন্দবাবু তাঁর ডেক-চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে রইলেন। এইবারেই বুঝি তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা।

ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল খগেন।

–প্রতিকার চাই–অবিলম্বে চাই! ওই ছেলেটার গা থেকে যদি ছাল-চামড়া তুলে না নিয়েছি, তা হলে আমার নাম খগেন বটব্যালই নয়!

আনন্দবাবুর বললেন–অত চেঁচিয়ো না খগেন, আমার ব্লাড়প্রেশার বেড়ে যাবে।

–চেঁচাব না, মানে? জানেন আপনি? ওই বাঁদর ছেলেটা আবার আমার পিঠে গুলি করেছে।

–অসম্ভব!–আনন্দবাবু সজোরে মাথা নাড়লেন–অসম্ভব! এ কিছুতেই হতে পারে না।

–হতে পারে না মানে? আপনি কি বলতে চান আমার পিঠে শুধু শুধু মার্বেলের মতো ফুলে উঠেছে?

–তা আমি কী করে বলব? তোমার পিঠ ফুটবলের মতো ফুলে উঠলেই বা কী আসে যায়? বন্দুক রয়েছে আমার ঘরে, পিলটু কী করে গুলি ছুঁড়বে? কথাটা কী জানো খগেন? দিনরাত কালীকীর্তন গাইতে গাইতে মাথাটা বেশ একটু

গরম হয়ে গেছে তোমার। তাই সব সময় ভাবছ তোমার পিঠে কে যেন গুলি করছে।

খগেন ঘোঁত ঘোঁত করে বলল–আর ফোলাটা?

–বাত।

–বাত?–খগেন প্রতিবাদ করল–আমার বাত নেই। আমার বাত কখনও হয়নি।

–কিন্তু হতে কতক্ষণ?–আনন্দবাবু বললেন–ছেলেবেলাতে নিশ্চয় তোমার দাড়িগোঁফ ছিল না, কিন্তু এখন তো মুখভর্তি গজিয়েছে!

পিলটুর পিসিমা এবার আনন্দবাবুকে একটা ধমক দিলেন।

–আঃ, কী বকবক করছ তুমি?

বকবক মানে? সত্যি কথাই বলছি। অত ডিম, মুরগি কখনও সহজে হজম হয়? কোনদিন হয়তো বা খগেনের মনে হবে, ও একটা খাজা কাঁটাল, আর পৃথিবীর যেখানে যত কাক আছে, সবাই এসে ওকে ঠোকরাচ্ছে। কালীসাধকদের অসাধ্য কিছুই নেই।

পিসিমা চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আনন্দবাবুর দিকে। একটা কুটিল সন্দেহ হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছে তাঁর মনে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্বামীর কৈশোরের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে যেসব গল্প শুনতেন, তারই দুটো-একটা ভেসে উঠছিল স্মৃতির উপর।

–আমি কথা বলছি। খগেন, তুমি এখন বাইরে যাও।

গোঁ গোঁ করতে কালীসাধক বেরিয়ে গেল।

পিসিমা আনন্দবাবুর আরও কাছে এগিয়ে এলেন। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করতে করতে বললেনবন্দুক এ-ঘরের বাইরে যায়নি। গুলি তাহলে করল কে? শুনেছি, ছেলেবেলায় তোমার এয়ার গানের দৌরাত্মে পাড়ার লোককে তুমি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে। এ তোমারই কাণ্ড নয় তো?

–আমার? কী বলছ তুমি?–আনন্দবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

–সেইরকমই তো সন্দেহ হচ্ছে।

তারস্বরে প্রতিবাদ তুললেন আনন্দবাবু।

–এ অন্যায় সন্দেহ। অত্যন্ত অন্যায়। আমি খগেনকে গুলি করব কেন? ও কি গুলি করবার যোগ্য? ও খরগোশ নয়, পাখি নয়–এমন কি, নেংটি ইঁদুরও নয়। ও সকলের চাইতে অখাদ্য। ওকে গুলি করব কোন্ দুঃখে? বুড়ো বয়েসে আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

–তুমিই জানো।–সন্দিগ্ধ চোখে আর একবার কতার দিকে তাকিয়ে গিন্নী বন্দুক আর গুলির বাক্স তুলে নিলেন–যাই হোক, এটা দেখছি তোমার কাছেও নিরাপদ নয়। আমার ঘরেই আমি নিয়ে চললুম।

গিন্নী বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল আনন্দবাবুর। যাকফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু পিলটুর জন্যে এখন দুঃখ হচ্ছে। ওকে ডেকে আঠারোটা অঙ্ক থেকে অন্তত নটা তাঁর কষে দেওয়া উচিত। তাদের দুজনের দোষের ভাগ তো এখন সমান।

পিলটুকে ডাকতে যাচ্ছেন, হঠাৎ শুনলেন–হুজুর!

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দারোয়ান খুবলাল সিং।

–কী খবর খুবলাল?

–একটা আরজি আছে হুজুর।

–কী আরজি? চটপট বলে ফেলল।

–হিনুর ওধারে যে বাগানটা কিনিয়েছেন হুজুর, তার একজন দারোয়ান চাই বলছিলেন না?

–তা লোক পেয়েছ?

–লোক তো আছেই হুজুর। হামার ভাতিজা দুবলাল সিং।

আনন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন–দুবলাল? ওই চিংড়ি মাছের মতো ছোঁকরাটা? ওটা তো অকর্মার গোঁসাই। নানা–ওকে দিয়ে কাজ চলবে না।

খুবলাল বলল–ওকে লিবেন না হুজুর?

–পাগল নাকি?

–তোবে হামি গিন্নীমার কাছে যাচ্ছে। গিয়ে বোলছে, আমি দেখলাম কি, বাবু বন্দুক নিয়ে খগেনবাবুর পিঠ বরাবর গোলি মারিয়ে দিল।–খুবলাল বিনীত হাসি হাসল।

–আঁ?–আনন্দবাবু চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে পড়লেন।

–আর দুবলালকে নোকরিটা দিলে হামি কুছু জানে না। কুছু দেখেনি।

–আলবাত–আলবাত!–আনন্দবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন–চমৎকার লোক দুবলাল। বাগানের জন্যে আমি এখনি ওকে নিয়ে নেব। কিন্তু জানোই তো খুবলাল, গিন্নীমাকে রাজি করাতে না পারলে–

–হুঁ।–এইবারে খুবলালও চিন্তিত হল।

–গিন্নীমা বললে আমি সঙ্গে সঙ্গেই দুবলালকে চাকরি দেব। কিন্তু গুলি করবার কথাটা–

–হামি কুছু জানে না হুজুর, হমি কুছু দেখেনি।

সেলাম করে খুবলাল বিদায় নিয়ে চলে গেল। সন্ধে হয়ে গেছে। শরতের জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে চারদিক। আনন্দবাবু নিজের ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ সম্বন্ধে কী একটা ইংরেজী বই পড়ছেন। পিলটু আঠারোটা অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, এখন পর্যন্ত তার ছটার বেশি কষা হয়নি। পিলটুর পিসিমা খগেনের জন্যে মুরগির রোস্টের তত্ত্বাবধান নিয়ে রান্নাঘরে ব্যতিব্যস্ত।

আর বাগানে সেই বাঁধানো পাথরের বেদীটার উপরে বসে খগেন গান ধরেছে–

ডুব দে রে মন কালী বলে–

সেই সময় রান্নাঘরের সামনে এসে খুবলাল সিং ডাক দিল–মাঈজী।

গিন্নী বেরিয়ে এলেন।

–কী হয়েছে দারোয়ান?

–বাবুর নতুন বাগানটার জন্যে হামার ভাতিজা দুবলালকে যদি দাবোয়ানী দেন–

–দুবলালকে?–গিন্নী চটে উঠলেন–ওকে দিয়ে কী হবে? ওই তো পাকাটির মতো শরীর। বাগানের বাঁদর তাড়ানো দুরে থাক, বাঁদররাই ওকে তাড়িয়ে দেবে। নানা–ওসব লোকে কাজ চলবে না।

–ওকে লিবেন না মাঈজী।

–উঁহু, অসম্ভব।

–আদমি বহুৎ ভালো ছিল মাঈজী। গিন্নী কড়া গলায় বললেন–ভালো আদমিতে আমার দরকার নেই। আমি চাই ভালো দারোয়ান। ও সব হবে না।

–হোবে না?

–না। গিন্নী ব্যাপারটা ওইখানেই মিটিয়ে দিয়ে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বিমর্ষ হয়ে খুবলাল চলে গেল। মাঈজীকে রাজি করানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এই বুন্ধু ভাইপোটাকে নিয়ে বিপদেই পড়া গেল! ঘাড় থেকে না নামাতে পারলে তার যথাসর্বস্ব খেয়ে শেষ করে দেবে! কী করা যায়।

.

আনন্দবাবুর বাগানে জ্যোৎস্নায় পাখি ডাকছিল। আর গিন্নীমার ঘরে তাঁর বড় আয়নাটা পরিষ্কার করতে করতে গোপালের মন উদাস হয়ে গেল।

সেই ছেলেবেলার দিনগুলো। নদীতে সাঁতার কেটে, গাছে উঠে, মাঠে চরে খাওয়া ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে তাকে ছুটিয়ে দেওয়া-সে কতকাল আগেকার কথা!

ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পিলটুর এয়ার গানটা রয়েছে। মনে পড়ল, সে আর জমিদারের ছেলে কান্তিবাবু বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পেটমোটা শেয়াল সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর কান্তিবাবু বলছেন-এই গোপলা, মার তো মার তো ওই শেয়ালটাকে

অন্যমনস্ক হয়ে বন্দুকটা তুলে নিল গোপাল। একটা গুলিও ভরল। বাগানের সেই বেদীতে বসে সমানে গান গেয়ে চলেছে খগেন। একটু দূরেই রান্নাঘর। সেখান থেকে মুরগির রোস্ট আর খাঁটি ঘিয়ের প্রাণ-মাতানো গন্ধ আসছে। গন্ধটা যত নাকে লাগছে-ততই খগেনের গলা চড়ছে-

ডুব দে রে মন কালী বলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কালী-কুণ্ডলিনীর কূলে—

গোপাল জানলার কাছে এগিয়ে এল। জ্যোৎস্নায় খগেনের পিঠটা চকচক করছে। হঠাৎ গোপালের মনে হল, ও খগেন নয়-যেন একটা উঁড়ো শেয়াল বসে আছে ওখানে। আর কান্তিবাবু যেন পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন-মার গোপাল-মেরে দে ওকে-

বন্দুকে আওয়াজ উঠল-খটাস্।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছটাস করে বাগদা চিংড়ির মতো লাফিয়ে উঠল খগেন। হেঁড়ে গলার আর্তনাদ উঠল কাঁপিয়ে-বাপরে-গেলুম!

গিন্নীর ড্রেসিং টেবিলের উপর বন্দুকটা নামিয়ে রেখে গোপাল তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে উধাও হল।

.

শেষ মার

–কাকিমা–কাকিমা–কাকিমা–

রাঁচি নামকুম, হিনু–ডুরান্ডা সব একসঙ্গে কাঁপিয়ে খগেন গগনভেদী চিৎকার করতে লাগল।

রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন গিন্নী।

–কী হয়েছে! অত চেঁচামেচি কেন?

–চেঁচাব না? দক্ষযজ্ঞ করব এইবারে। আবার কে আমায় গুলি করেছে।

পিলটুর পিসিমা অবাক হয়ে গেলেন।

–পাগল নাকি? বন্দুক তো আমার ঘরে। কে গুলি করবে তোকে?

–তা জানি না, কিন্তু এই দ্যাখো, পিঠটা প্রায় ফুটো করে দিয়েছে এবার।

–অসম্ভব। পিলটু কখনও আমার ঘরে ঢুকবে না। তুই খেয়াল দেখেছিস খগেন।

–খেয়াল, খগেন হাঁই-মাই করে উঠল–পিঠটা টোম্যাটোর মতো ফুলে উঠেছে, আর তুমি বলছ খেয়াল! ও সব বদখেয়াল আমার নেই।

গিন্নী চিন্তায় পড়লেন। তারপর খগেনকে নিয়ে এগোলেন কর্তার ঘরে।

–শুনছ? আবার কে খগেনকে বন্দুক মেরেছে।

আনন্দবাবু এবার সত্যি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

–কিন্তু বন্দুক তো তোমার ঘরে গুলি করবে কে? যত সব আজগুবি কথা! আমি তো আগেই বলেছি, অতগুলো মুরগির ডিম খেয়ে খগেনের পেট গরম হয়ে গেছে। তাই আবোল-তাবোল বকছে।

খগেন জোরালো গলায় প্রতিবাদ করল।

–না, আমি মোটেই আবোল-তাবোল বকছি না।

–নিশ্চয় বকছ! রাঁচিতে যখন এসেছ তখন আর একটু এগোলেই তুমি কাঁকেতে পৌঁছবে। সেইখানেই যাও, সেইটিই তোমার পক্ষে আদত জায়গা।

গিন্নী বললেন–থামো। খগেন, তা হলে তুমি বলতে চাও ভূতেই তোমাকে গুলি করেছে?

–ভূত-ফুত জানি না। আমার পিঠটাকে যেন ঝাঁঝরা করে দিল। কাকিমা, তুমি যদি এর ব্যবস্থা না করো, তা হলে এখানে আমি আর থাকব না। এখান থেকে সোজা বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করতে চলে যাব।

আনন্দবাবু বললেন–আঃ, থামো না তুমি। শোনো খগেন, এখন এ-ভাবে আর দাপাদাপি কোরো না। আজ রাতে ভালো করে খেয়েদেয়ে গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে আমি যা হয় এর একটা ব্যবস্থা করব।

–বেশ, একটা রাত আপনাদের সময় দিচ্ছি। কাল সকালের মধ্যে যদি এর প্রতিকার না হয়–তা হলে আমি কিন্তু কেলেঙ্কারি করে ছাড়ব।

দাপাদাপি করতে করতে কাকিমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেল খগেন।

খগেন মিথ্যা নালিশ করেনি, আনন্দবাবু তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু গুলিটা সত্যিই করল কে? পিলটু নয়–তিনিও নন। তবে কি ভূতের কাণ্ড?

ভাবতেই আনন্দবাবুর গা ছমছম করে উঠল, ভূতকে দারুণ ভয় পান তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, খগেনকে ভগবানও ভয় পান-ভূতের সাধ্য কি ওকে গুলি করে?

–বাবু?

ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকল গোপাল।

–কী রে গোপাল, কাঁদছিস কেন?

গোপাল এসে আনন্দবাবুর পা জড়িয়ে ধরল।

–আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, আমি এখান থেকে চলে যাব।

–সে কী রে? হঠাৎ কী হল তোর?–আনন্দবাবু আকাশ থেকে পড়লেন কুড়ি বছর চাকরি করে তুই হঠাৎ চলে যাবি মানে? তোর গিন্নীমা বকেছে বুঝি?

–কেউ বকেনি বাবু। আমি ভারি অন্যায় করেছি।–গোপাল ফোঁস ফোঁস করতে লাগল সমানে।

–কী অন্যায় করেছিস?

–আমি–আমি–খগেনবাবুর পিঠে গুলি করে দিয়েছি বাবু। হঠাৎ বন্দুকটা দেখে মাথাটা কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, ছেলেবেলায় অমন তাক ছেলে-একেবারেই ভুলে। গিয়েছি নাকি? তারপর–তারপর কী যে করে ফ্যালোম–

আনন্দবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন।

–তা হলে ওটা তোর কাণ্ড! যাক–চেপে যা। বেমালুম চেপে যা। কিছু অন্যায় করিসনি। খগেনের পিঠে তাক করার রাইট সকলেরই আছে। কোনও দোষ করিসনি তুই।

–কিন্তু গিন্নীমা যদি সন্দেহ করেন–

–কোনও ভয় নেই, আমি আছি।

.

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজল। পিঠের ব্যথা ভোলবার জন্যে একটা আস্ত মুরগির রোস্ট একাই সাবাড় করল খগেন। তারপর বাগানে এসে বসল।

ওদিকে কাজকর্ম সেরে পিলটুর পিসিমা তাঁর জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিলটুর পিসিমার মনে পড়ল, ছোটবেলায় তাঁর দিনগুলো আসামে কেটেছে।

যে শহরে তাঁরা থাকতেন, সেখান থেকে দূরে বর্মা সীমান্তের নীল পাহাড়গুলোকে দেখা যেত। মেঘ ঘনিয়ে আসত সেগুলোর উপর দিয়ে। গাছপালায় ভিজে হাওয়া মর্মর তুলত। কত ফুল ফুটত–আর কত প্রজাপতি! কী আনন্দে বনের ভিতর খেলা করে বেড়াতেন তিনি।

আর, কী দুরন্ত ছিলেন নিজেও!

তাঁর দাদার এয়ার গান ছিল একটা। তিনিও সুযোগ পেলেই দখল করতেন সেটা।

বেশ টিপও হয়ে গিয়েছিল হাতের। চড়ই মেরেছেন, দেওয়াল থেকে টিকটিকি নামিয়ে এনেছেন কতবার! সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরেরও আগেকার কথা। এখনও কি সে হাতের টিপ তাঁর আছে?

ভাবতে ভাবতে একসময় পিলটুর বন্দুকটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন তিনি।

দাদার বন্দুকটা এত সুন্দর ছিল না। কিন্তু বড় ছিল এর চাইতে। পিলটুর পিসিমা বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলেন। ঠিক এইভাবেই গুলি ভরতে হত। সবই প্রায় এক রকম।

তারপর কী খেয়াল হতে বন্দুকে গুলি ভরে দেওয়ালের দিকে চাইলেন একবার।

না–একটা টিকটিকিও কোথাও নেই। হাতে তখনও বন্দুকটা রয়েছে।

বাবা কত ভালবাসতেন। বলতেন, ইয়োরোপের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যায়। সিংহ, হিপো, আরো কত কী শিকার করে।

সূচিপত্র

আমার মেয়েকেও বিদেশি মেয়েদের মতো গড়ে তুলব। বাঙালীর মেয়েরা কেবল ঘরের কোণে বসে থাকে আমার কল্যাণী বাঙালী মেয়েদের অপবাদ দূর করে দেবে।

পিলটুর পিসিমা–অর্থাৎ কল্যাণীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কিছুই হল না। কেবল আনন্দবাবুর ঘর-সংসার করেই তাঁর জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেল।

বন্দুকটা হাতে নেবার পর থেকেই ক্রমাগত হাতটা যেন তাঁর নিশপিশ করছে।

একটা কিছু করা চাই–যে-কোনও একটা লক্ষ্যভেদ। দেওয়ালে টিকটিকি নেই–এত রাতে চড়ুই পাখিই বা তিনি পাবেন কোথায়? মনে পড়ল, একবার দাদার বন্দুকটা নিয়ে গাছে কী একটা পাখির দিকে তাক করেছেন, হঠাৎ একটা মস্ত বড় গোরু শিং নেড়ে ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে এসেছিল তাঁর দিকে। কল্যাণী ছোট হলেও তাঁর সাহস কম ছিল না। পাখি ছেড়ে গোরুটার দুটো শিংয়ের ঠিক মাঝখানে খটাস করে গুলি করে বসলেন।

গোরুটা থমকে দাঁড়াল। তারপরেই লেজ তুলে উলটো দিকে ভোঁ দৌড়!

কল্যাণীর চোখে যেন স্বপ্ন ঘনিয়ে এল।

বাগানের মধ্যে কে যেন বসে আছে। জ্যোৎস্নায় চওড়া পিঠটা দেখা যাচ্ছে তার। কল্যাণীর মনে হলো, ওই সেই শিং-ওলা গোরুটা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওকেই গুলি করব? করি, করে দেখি না–কী হয়!

কল্যাণী বন্দুক তুললেন, নিশানা ঠিক করলেন।

তার একটু আগেই চাপাটি খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল খুবলাল সিংয়ের। সকালে যে-ছাগলটাকে সে বাগানে বেঁধে রেখেছিল, সেটাকে ঘরে আনা হয়নি। যদি শেয়ালের পেটে যায়?

চটপট বাগানে চলে এল খুবলাল।

আর খুঁটি থেকে ছাগলটার দড়ি খুলে দিতে গিয়েই দেখল-জানলায় গিন্নীমা দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোতে যেন ফ্রেমের ভিতর একখানা ছবি। আর তাঁর হাতে বন্দুক।

কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়ে ও কী করছেন গিন্নীমা? আরে আরে-সোজা খগেনবাবুর পিঠ বরাবর তাক করছেন যে!

খুবলাল চোখ কচলাল। স্বপ্ন দেখছে না তো সে?

–খটাস–

–বাবা গো, গেছি–

প্রাণপণে লাফ মারল খগেন। আর গিন্নীমা টুপ করে জানলার নীচে বসে পড়লেন!

.

পিলটুর পিসিমা সোজা এসে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। ততক্ষণে চটকা ভেঙেছে তাঁর।

ছিঃ ছিঃকরেছেন কী তিনি! শেষকালে তিনিও কিনা খগেনের পিঠে–

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কে এসে যেন ঘা দিল তাঁর দরজায়।

কল্যাণী উঠে দরজা খুললেন। বাইরে আনন্দবাবু আর খুবলাল সিং দাঁড়িয়ে।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার কাশলেন আনন্দবাবু। তারপর বললেন- এই খুবলাল সিং বলছিল, ওর ভাইপো দুবলালকে যদি আমাদের হিনুর বাগানটায়-

কল্যাণী চটে উঠলেন।

-সেইজন্যে তুমি এত রাতে ওকে নিয়ে আমায় বিরক্ত করতে এলে? আমি তো বলেই দিয়েছি, ও-সব লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না?

-তা না হয় না-ই চলল। কিন্তু এই খুবলাল বলছিল, তুমি নাকি একটু আগেই বন্দুক দিয়ে খগেনের পিঠে-

কল্যাণী মেঝেয় বসে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন। সামলে খাবি খেলেন বার কয়েক।

ভক্তিভাবে একটা সেলাম ঠুকল খুবলাল।

-তাই আমি বোলছি মাঈজী, দুবলালের নোকরিটা যদি মিলে যায়, তব হামি খুবলাল সিং কুছু দেখেনি, কুছু জানে না, কুছু বোলে না। নেহি তো-

কল্যাণী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন-না-না, তুমি কিছু দেখোনি, কিছু জেনেও তোমার কাজ নেই। বাবুর যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে কালই তোমার ভাইপো হিনুর বাগানের কাজে বাহাল হয়ে যাবে।

–মাঈজীর বহুৎ দয়া!

আর একটা জোর সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল খুবলাল। আর বাইরে গিয়ে ছাগলটাকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে চলল নিজের ঘরের দিকে। এই ছাগলটাই তার লক্ষ্মী–এরই গুণে তার অকর্মার ঢিবি ভাইপোটার গতি হয়ে গেল!

সেই সময় গগনভেদী রোল তুলে গিন্নীর ঘরে এসে প্রবেশ করল খগেন।

–কাকিমা–আবার!

কল্যাণী ভুরু কুঁচকে বললেন–কী আবার?

–আমার পিঠে গুলি মেরেছে।

শুনে চটে চেঁচিয়ে উঠলেন এবার কল্যাণী।

–তোর মাথাই খারাপ হয়েছে খগেন। রাতদিন কে তোর পিঠে গুলি মারতে যাবে, শুনি?

–কে মেরেছে কেমন করে বলব? তবে একেবারে কমলানেবুর মতো ফুলে উঠেছে। এবার।

আনন্দবাবু বললেন–বাত।

খগেন তারস্বরে বললে–না, বাত নয়।

–তবে আমবাত।

সূচিপত্র

–আমবাতও নয়।

–ওহো, তা-ও বটে।–আনন্দবাবু মাথা নেড়ে বললেন কমলানেবুর মতো ফুলে উঠেছে বলছ যখন, তখন ওটা বোধহয় নেবুবাত।

–না, নেবুবাতও নয়। খগেনের আবার প্রবল প্রতিবাদ শোনা গেল।

–এজ্ঞে, বাত না হলে বাতিক। বাতের বাড়াবাড়ি হলেই বাতিক।–ইতিমধ্যে গোপাল এসে আসরে পৌঁছেছিল, শেষ কথাটা সেই ঘোষণা করল।

–বাতিকই বটে! পিলটুর পিসিমা এবার একমত হলেন গোপালের সঙ্গে।

খগেন এবার নিদারুণভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

–ওসব বাজে কথা বুঝি না। এবাড়ি হচ্ছে স্রেফ মানুষ-মারা কল। এখানে আর আমি একদিনও থাকব না। আমার সমস্ত পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কালই আমি বদরিকা আশ্রমে কালীসাধনা করতে চলে যাব।

কল্যাণী ঝামটা দিয়ে বললেন–তাই কর গে যা। আমার হাড় জুড়োয়।

আনন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো। নইলে কাঁকের পাগলা গারদেই পাঠাতে হবে তোমাকে।

–হুঁম?–

ঝাঁকড়া দাড়িগোঁফের ভিতর থেকে এক বিকট হুঙ্কার ছেড়ে দাপাতে-দাপাতে চলে গেল খগেন।

.

পরদিন সকাল।

গেটের বাইরে নিজের মোটর সাইকেলটাকে ঠিক করছিল খগেন। এ বাড়িতে আর সে থাকবে না। মুরগি, সন্দেশ, আপেল আর দুশো টাকা মাইনের আশাতেও নয়।

একটু দূরে বাগানের ভিতর পিলটুর বন্দুক হাতে আনন্দবাবু আর গোপালের প্রবেশ। আনন্দবাবু গোপালকে জিজ্ঞেস করেলন-তুই কদুর থেকে মেরেছিলি খগেনকে?

-এজ্ঞে বাবু, বারো গজ হবে।

-আর তোর গিন্নীমা?

-এজ্ঞে, সাত-আট গজ হবে।

-শেম! ও তো টার্গেটে মারা নয়, পাহাড় শিকার করা। আচ্ছা, খগেন এখন কতদূরে আছে?

-অন্তত কুড়ি গজ হবে।

-তবে এই দ্যাখ-

খটাস করে বন্দুক ছুঁড়লেন আনন্দবাবু।

-বাপরে গেছি-

খগেন লাফিয়ে উঠল শূন্যে। তারপর মাটিতে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় লাফে চড়ে বসল মোটর সাইকেলে আর প্রাণপণে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

আনন্দবাবু বললেন-ভাবছিস হঠাৎ লাগল? তা নয়। তাদের সক্কলের চাইতে আমার হাতের টিপ যে কত ভালো, দ্যাখ আবার সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি।

আবার বন্দুক ছুঁড়লেন-খটাস।

-ওরেঃ বাবা!

এবার সিটের উপরেই দেড় হাত নেচে উঠল খগেন-আর তারপরেই ভট ভট আওয়াজ উঠল মোটর সাইকেলে। দেখতে দেখতে দাড়িগোঁফ আর সেই ধুসো-কোট সুষ্ঠু খগেনকে নিয়ে মোটর সাইকেল নক্ষত্রবেগে উধাও হয়ে গেল।

আনন্দবাবু বললেন কালীসাধনা করতে চলে গেল।

গোপাল মাথা নেড়ে বললে-এজ্ঞে, হ্যাঁ। মায়ের ডাক কিনা- বড্ড তাড়া।

(একটি বিদেশি গল্পের প্রভাবে)